"স্মৃতি পাথেয়"

সুজাতা চৌধুরী (রায়)*

আমাদের যুগের প্রেসিডেন্সি কলেজের বিষয়ে লিখতে বসে নানা কথা মনে আসে।

আমার সঙ্গে এ কলেজের যোগ চার প্রজন্মের। আমার পিতামহ ঁক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী, আমার পিতা ঁপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, আমার দাদা ঁপ্রসেনজিৎ রায়, সকলেই এই কলেজে পড়েছিলেন। আমার পিতামহ এবং পিতা দুই জনেরই শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি ছিল। পিতামহ তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষভাবেই সুবিদিত ছিলেন। আমার মাতুল কুলে আমার মার জ্যাঠামহাশয় ঁরজনীনাথ রায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে ঈশান বৃত্তি লাভ করেন এবং তিনি প্রথম ভারতবর্ষীয় যিনি Accountant General, Bengal-এর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রজনীনাথের কন্যা অমিয়াও এই কলেজে পড়তেন। ডঃ প্রসন্নকুমার রায় অধ্যক্ষ থাকা কালে যে অল্পসংখ্যক ছাত্রী পরীক্ষামূলকভাবে ঐ কলেজে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতমা। ডঃ রায়ের সহশিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা বোধ হয় কৃতকার্য হয় নি। কারণ তারপর বহুদিন আর কোনো ছাত্রী ওখানে পড়েন নি।

আমাদের প্রজন্মের থেকে আমার দাদার নাম আগেই করেছি। তারপর আমি তাঁর দুই বছর পর ওখানে এম. এ. পড়তে যাই। আমার শ্বশুর কুলের থেকে আমার স্বামী ঁকান্তিপ্রসাদ চৌধুরী ওখান থেকে বি. এ. এবং এম. এ. পাশ করেন। আমার কন্যা ইন্দ্রাণী এবং পুত্র সুকান্ত ওখান থেকেই বি. এ. পাশ করেছে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ঈশান বৃত্তির একটা শর্ত আছে যে যিনি ঐ বৃত্তি পাবেন তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এ. পড়তে হবে। এই শর্তানুসারে ঈশান বৃত্তি পাওয়া ছাত্রীরা (যেমন আমাদের সময়ের শান্তিসুধা ঘোষ এবং নলিনী দাশ) সেখানে এম. এ. পড়েছেন। তবে প্রচলিত নিয়মে ওখানে ভর্তি হবার অধিকার ছাত্রীরা অনেক পরে পেয়েছেন।

বাবার আমলে (তিনি ১৯০৩-১৯০৬ এই সময়ে ওখানে পড়েছিলেন) প্রেসিডেন্সিতে সহশিক্ষা বিষয়ে নানা মজার গল্প তাঁর কাছে শুনতাম। তারই একটি এখানে শোনাচ্ছি। তখনকার দিনে একটু পশ্চিমী ধরণে "আলোক প্রাপ্তা" মেয়েদের মধ্যে একটা ফ্যাসান হয়েছিল কাঁধের brooch-এর সঙ্গে একটি ছোট্ট ঘড়ি আটকে রাখা (অবশ্য আমাদের মনে হয় ঐ ঘড়িতে সময় দেখতে হলে কিছু উদয়শংকরী ভঙ্গী জানা প্রয়োজন!)। একদিন ছাত্রীরা ক্লাসে গিয়ে দেখেন যে কয়েকটি ছাত্র তাঁদের পাঞ্জাবির কাঁধের সঙ্গে একটি alarm ঘড়ি আটকে এসেছেন!

আমরা যে সময়ে স্কুলে বা কলেজে পড়তাম তখন সকলেরই ধারণা ছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেলেদেরই কলেজ, ওখানে মেয়েদের কোনো স্থান নেই। আমরা যখন সবে কলেজে পড়তে যাব, তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে সহশিক্ষা আরম্ভ হল। আমি মফঃস্বলে মানুষ। আমার বাবা গুয়াহাটির কটন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক এবং পরে সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন। আমি ঐ কলেজের প্রথম ছাত্রী । ওখানেই আমি বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। কিছুদিন পরে নানা কারণে ওখান থেকে বদলে স্কটিশ চার্চ কলেজে চলে আসি এবং ওখান থেকেই বি. এ. পাশ করি।

আমার বরাবর একটা দুঃখ ছিল যে আমাদের পরিবারের এত জন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন, শুধু মেয়ে হবার "অপরাধে" আমি সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। বাবা আমার সে দুঃখের কথা জানতেন এবং তিনি বললেন, "তুমি ত এবার নতুন ক্লাসে পড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। এবার দেখি না একটা দরখাস্ত দিয়ে।" কোন শুভ মুহূর্তে সে দরখাস্ত পৌঁছেছিল জানি না! বাবার চেনাশোনা অনেকেই প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বাবার সমসাময়িক (সহপাঠী নন) এবং বন্ধু ছিলেন। তিনি ক'দিন পর জানালেন যে কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে যে বি. এ. ক্লাসে ছাত্রী ভর্তি করার বিরুদ্ধে Governing Body-র একটা নিয়ম আছে। তবে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি করা যাবে না, এ ভাবে স্পষ্ট কিছু লেখা নেই। এই অবস্থার সুবিধা নিয়ে আমার আবেদন গ্রাহ্য হয়ে গেল এবং এত দিন পর আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল।

আমি যথাসময়ে কলেজে এসে ভর্তি হলাম। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন ভূপতিমোহন সেন। যখন আমি ভর্তি হতে গেলাম তিনি আমাকে বললেন, "তুমি ভর্তি হচ্ছ ঠিকই, কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো, তোমাকে আমরা কোনো বিশেষ সুবিধা করে দিতে পারব না, এমনকি একটা আলাদা বসার জায়গাও থাকবে না। আমিও বললাম, "তাতে আমার অসুবিধা নেই। আমি লাইব্রেরিতে থাকতে পারব।" শেষ পর্যন্ত আমরা উভয়েই কথা রেখেছিলাম এবং তার জন্য অসুবিধাও ভোগ করি নি।

একজন আমার ভর্তি হওয়া নিয়ে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন এবং সর্বদা আমার সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করেছিলেন। তিনি অধ্যক্ষ মহাশয়ের পত্নী। আমার ভর্তি হবার পর পরই তিনি আমাকে বাড়ীতে ডেকে খাইয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "তুমি আমাদের কলেজের একটি মাত্র মেয়ে, যখন ইচ্ছা এখানে চলে আসবে।" এইভাবে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর্ব সাঙ্গ হল।

এরপর কলেজের দিনগুলির কথা বলি। আমাদের এম. এ. ক্লাস তখন প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়েই হত। ওখানে tutorial class-ও হত। অধ্যাপকদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ছিলেন যাঁরা

* প্রাক্তন ছাত্রী ১৯৩৩-৩৫ (ইংরেজি)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক হলেও বিশ্ববিদ্যালয়েও সপ্তাহে ২/১ টি ক্লাস নিতেন, যেমন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার প্রেসিডেন্সিরই ২/১ জন অধ্যাপক, যেমন অধ্যাপক অপূর্ব কুমার চন্দ, প্রেসিডেন্সিতেই এম. এ. ক্লাস নিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন না। তবে প্রেসিডেন্সির অধ্যাপকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যদি তাঁদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্লাসে আসত, তাতে আপত্তি করতেন না। একজন স্পষ্ট বক্তা গুরুমহাশয় ত পরিষ্কার বলেছিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ যার ইচ্ছা এস। পরে যে কথা বেরবে যে প্রেসিডেন্সির প্রফেসাররা তাঁদের ছাত্রদের ডেকে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রশ্ন বলে দেন, তা হবে না।"

আমার এখনো মনে পড়ে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠিনী ছাত্রীরা প্রথম প্রেসিডেন্সিতে প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের ক্লাস করতে আসে, তিনি আমাকে আগে ডেকে বিশেষ করে বলেছিলেন, "তুমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থেকে, বাইরের থেকে আসা মেয়েদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসবে। Treat them as our guests"। এই নিয়ে আমার সহপাঠিনীরা আমায় খুব ঠাট্টা করতো।

আমার সময় কাটতো এইভাবে—দ্বারভাঙ্গা ভবন এবং আশুতোষ ভবনে ক্লাস করতাম। যখন ক্লাস থাকতো না, তখন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে নয় ত প্রেসিডেন্সির লাইব্রেরিতে সময় কাটাতাম। বাকি সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের common room-এ থাকতাম। Sixth Year-এ ওঠার পর এর একটু রকম-ফের হল। প্রেসিডেন্সির Seminar Library-র আমি Secretary হলাম। তখন থেকেই English Seminar Library ছিল দোতালার বারান্দার শেষে ছোট্ট ঘরটিতে। আমি ১৯৩৫-এ এম. এ. পাশ করেছি। আমাদের সময়ে এম. এ. ক্লাস হত ২৩ নং ঘরে। সেখানে বসলে পাশে Y.M.C.A-র Hostel-এর ছাদ দেখা যেত। সেই ছাদের উপর অনেক বাঁদর থাকতো। একদিন কিসের খোঁজে জানি না, এক মর্কট নন্দন এক লাফে আমাদের ক্লাসে আবির্ভূত হল। তখন আমাদের অপূর্ব চন্দ মহাশয় পড়াচ্ছিলেন। বেশ কয়েক মিনিট একটা খালি desk-এর উপর বসে সে আমাদের সকলকে নিরীক্ষণ করলো। তখন আমরা ক্লাসে ১০/১২ জন মেয়ে ছিলাম এবং এবং দুটি আলাদা বেঞ্চে বসতাম। বেশ করে ভেবে নিয়ে সে ধীরে ধীরে আমাদের বেঞ্চের দিকে এগোতে লাগলো। ২/৪টি ছাত্র হাতের কাছে বই, খাতা, ছাতা যা পেল তাই নিয়ে উঠে পড়লো। ওদিকে চন্দ মহাশয়ও register হাতে নিয়ে এগোতে লাগলেন। এই মিলিত আক্রমণের মুখে discretion is the better part of valour এই সিদ্ধান্তে এসে বাঁদর পিছু হটে এক লাফে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এ পর্যন্ত আমি যা লিখেছি তাতে সে আমলের সহ-শিক্ষার বিষয়ে একটা কথা বোধ হয় স্পষ্ট হয় নি। এখন চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে, কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের কথাবার্তা শুনে, একটা ধারণা হয় এবং সে ধারণা মনে হয় ভুল নয়। এখন ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যের সম্পর্কটা অনেক বেশী সহজ হয়েছে। তারা বেশ স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশা করে। আমাদের সময়ে একটা জড়তা বা কুণ্ঠার ভাব এসে পড়তো এবং সেটা কাটাতে কিছু সময় যেতো। আমি যখন প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হই তখন ঐখানেই এক ছাত্র ছিলেন যাঁর মা এবং আমার মা বেথুন কলেজে সহপাঠিনী এবং বন্ধু ছিলেন। পরস্পরের পরিচয় জানা থাকলেও কেউই এগিয়ে কথাবার্তা বলার মধ্যে যাবার কথা ভাবি নি। সেদিক থেকে আমাদের সময়ে সংকোচটা বোধ হয় একটু বেশী ছিল। একা ছাত্রী হয়ে সে অসুবিধা আমি প্রথমে খুবই বোধ করতাম তবে তা ক্রমশঃ অনেকটা কেটে গেল। আরও একটা কারণ ছিল যে আমি ঐ কলেজে এম. এ ক্লাসে পড়তে গিয়েছিলাম। সেখানে ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা (5th এবং 6th year মিলিয়ে) খুবই কম ছিল এবং বয়সও প্রাকস্নাতক ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় পরিণত ছিল। যখন কলেজে ঘোরা ফেরা করতাম, তখন অবশ্য সব শ্রেণীর ছাত্রদের সংস্পর্শেই আসতে হত। সেই সময়কার ছাত্রদের সহস্র ধন্যবাদ যে তাঁরা কোনো দিন আমায় কোনো রকম অসুবিধার মধ্যে ফেলেন নি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যাঁদের কাছে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবার তাঁদের কথা একটু বলি। সবার আগে যাঁর কথা মনে আসে তিনি ঁপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাঁর কাছে পড়ার অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে তাঁরা কোনো দিন তা ভুলতে পারবেন না। তিনি আমাদের Shakespeare-এর *Othello, Measure for Measure* এবং *Antony and Cleopatra,* আর Chaucer-এর *Prologue to the Canterbury Tales* পড়িয়েছিলেন। তিনি পড়াবার সময় শেষের ঘন্টার ক্লাসটি বেছে নিতেন। তার কারণও তিনি গোড়াতেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে নাটকের কোনো চরিত্র কাউকে মেরে ফেরার জন্য হাত তুলেছে, এই রকম একটা জায়গা তিনি পড়াচ্ছেন, ঠিক সেই সময় যদি ঘন্টা পড়ে, তা হলে ত খুনীকে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে পরের সপ্তাহ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অকাট্য যুক্তি সন্দেহ নেই! তাঁর পড়ানো আমার এত ভাল লাগতো যে কোনো দিন মনে হত না যে ক্লাসের সময় পার হয়ে গেছে, আর কেন থাকা! তিনি কখনই শুধু শুষ্কভাবে মানে বুঝিয়ে বা কয়েকটি মামুলী বা ধার করা মন্তব্য করে ছেড়ে দিতেন না। তাঁর কাছে আমরা নাটকই বেশী পড়েছি, অথবা "Rape of the Lock" -এর মতন নাটক ঘেঁষা কবিতা। এগুলি পড়াবার সময় তিনি প্রথমে যেভাবে নাটক বা কবিতার লাইনগুলি পড়ে শোনাতেন, তাতেই যেন চরিত্র এবং ঘটনাগুলি পরিষ্কার হয়ে চোখের সামনে দেখা যেত। শুধু তাই নয়, পড়ে শোনাবার সময় যেন তিনি সেই নাটক বা কবিতার ঘটনাবলীর মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। *Othello* নাটকে যেখানে Othello হিংসায় প্রায় উন্মাদ হয়ে Desdemona-কে চড় মারে (Act IV Sc. i. ll 235 seq-q) সেখানে পড়তে গিয়ে তাঁর দুই চক্ষে জল পড়তে লাগলো, রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি সেই কথাগুলি পড়লেন। Chaucer-এর *Prologue* পড়াবার সময় তাঁর মন্তব্য শুনতে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

শুনতে যেন চোখের সামনে সেই চরিত্রদের দেখতে পেতাম। সেই বিদেশের, বিগত কালের চরিত্রগুলি যেন মূর্ত হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াত। হাস্য-রস পরিবেশন করারও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। Puritan দের অদ্ভুত গোঁড়ামির কথা আমরা সকলেই শুনেছি। একদিন সেই বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বললেন, "A Puritan boy had been christened If-I-do-not -believe-in-Christ, then-may- I-be-damned Fairfax. Tired of calling him by that long name, his playmates used to call him Damned Fairfax !"

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্যের দ্বারাই অভিভূত করে দিতেন। ইংরেজি সাহিত্যের কোনো একটি বিশেষ সময়ের, বিশেষ ধরণের লেখার মধ্যেই তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ আমাদের আশ্চর্য্য করে।

অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ আমাদের Philology পড়াতেন। তিনি Oxford-এ পড়ার সময় বোধ হয় এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। নানা রকম chart ইত্যাদি এঁকে আমাদের দেখাতেন। আমরা, যারা তাঁর কাছে পড়তাম (অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ক্লাসে যেতাম) তারা প্রায় সকলেই A Group-এর ছাত্র-ছাত্রী ছিলাম, সুতরাং ঐ বিষয়ে বিশেষ রস পেতাম না। তবে তিনি ঐ শুষ্ক (আমাদের কাছে) বিষয়টি সরস করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। ক্লাসের বাইরেও পড়া সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি সব সময়ই সাহায্য করতেন।

আমাদের সময়কার ছাত্রজীবনের কথা বলতে গেলে রাজনীতির কথা না উঠে পারে না। Non-co-operation বা নক্‌শাল আমলের মতন উত্তাল না হলেও রাজনীতি যে তখন ছাত্রজীবনে কোনো ছায়াপাত করতো না এমন নয়। আমি যখন ছাত্রী (I. A. পড়ছি) সেই সময়ে বীণা দাশ বঙ্গলাটকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। তখনকার অনেক ছাত্রছাত্রীই বিদেশী জিনিস বর্জনের ব্রত নিয়েছিলেন। অনেকে গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের আর্থিক ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করতেন। যে ছাত্রছাত্রীরা খোলাখুলি ভাবে রাজনীতিতে অংশ নিতেন, তাঁরা মিটিং মিছিল করার ব্যবস্থা করতেন। রাজনীতি সম্বন্ধে পড়াশুনাও অনেকে করতেন। নিজেদের মধ্যে এ সব বিষয়েও প্রচুর আলোচনা হত। অনেক সময় সে সব আলোচনা চেঁচামেচির পর্যায়েও পৌঁছে যেত।

আমি খোলাখুলিভাবে রাজনীতিতে যোগ দিই নি। তবে কখনো যে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ি নি এমন কথা বলতে পারি না। দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। তখন আমি বাবার কাছে থেকে গুয়াহাটির কটন কলেজে বি. এ. পড়তে আরম্ভ করেছি, অর্থাৎ সময়টা ১৯৩১/৩২ এই রকম হবে। একদিন সন্ধ্যা বেলা বাড়ীতে বসে পড়ছি, এমন সময়ে বাইরের দরজায় মৃদু করাঘাত হল। আমি দরজা খুলে দেখি এক অচেনা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে তিনি বাবার নাম করে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। বাবা এলে তাঁকে খুব মৃদু কণ্ঠে কি বললেন আমি তা শুনতে পেলাম না। কথা শেষে বাবা আমাকে বললেন, "তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে চুপ করে বসে থাক। আমি এসে তোমায় ডেকে দরজা খুলতে না বললে তুমি কিছুতেই খুলবে না।" আমি নির্দেশ মতন দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। বেশ খানিক পরে বাবা এসে ডাকলে আমি দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও চিন্তিত। পরে তিনি আমাকে যা বললেন তা এই ঃ ঐ ভদ্রলোক Peddie সাহেবকে গুলি করে মারার সঙ্গে জড়িত। তাঁরা কয়েকজন মিলে পালিয়ে গুয়াহাটি পর্যন্ত এসেছেন। তাঁরা এগিয়ে বর্মা সীমান্তে পৌঁছে সেইভাবে ভারতের এলাকার বাইরে যেতে চান। কেউ একজন তাঁদেরকে বাবার নাম এবং ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। সেই ভরসায় তাঁরা এসেছেন। তাঁরা সীমানায় পৌঁছবার পথ চেনেন না। বাবা সেই ভদ্রলোককে মোটামুটি পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

একবার আমি নিজেই এই রকম একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। এটা অবশ্য আমার কলেজ জীবনের কয়েক বছর পরে। তখন আমি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। সময়টা ১৯৪০ দশকের গোড়ার দিকে। তখন দেশের আবহাওয়া উত্তাল, ইংরেজ হটাবার আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলছে। একদিন আমি ক্লাস শেষ করে পাশেই আমার আবাসনে ফিরছি। দেখলাম যে সেই ক্লাসেরই একটি মেয়ে আমাকে অনুসরণ করে এসেছে। সে সেখানকার স্বল্পসংখ্যক হিন্দু ছাত্রীদের একজন। তার বাবা ঐ শহরেই এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং সকলেরই পরিচিত। আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কি চায়। সে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, "আমি ঘরের ভিতর গিয়ে বলবো"। ঘরে এসে সে খুব চাপা গলায় যা বললো তা এই ঃ আলিগড়ে যারা ইংরেজ তাড়াবার জন্য হিংসাত্মক আন্দোলন চালাচ্ছে, তারা বাজার ইত্যাদি জায়গায় বোমা ফাটাচ্ছে। এখন তাদের টাকা ফুরিয়ে এসেছে, টাকা চাই। আমরা অবশ্য শহরে গণ্ডগোল হচ্ছে তা জানতাম। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মূল শহর থেকে বাইরে এবং বেশ খানিকটা দূরে। মেয়েটি এবার জোর দিয়ে বললো, "আপনার নাম কিছুতে প্রকাশ হবে না তা আমি শপথ করে বলছি, তবে টাকা না হলে আমরা বড় মুস্কিলে পড়বো।" আমি তখন আবাসনে একেবারে একা, অন্যেরা তখনো কাজ থেকে ফেরেন নি। আমি মেয়েটিকে বললাম, "আমি যা পারি তা দেব, তবে একটা শর্তে। তোমাদের ত বোমা ছাড়া অন্যান্য জিনিসও লাগে। তোমরা যদি এ টাকা কোনো অহিংস কাজে ব্যবহার কর, তবেই আমি দেব।" মেয়েটি সেই শর্তে রাজী হয়ে টাকা নিয়ে গেল। তার পর এ ব্যাপারে আর কিছু শুনি নি। তার অল্প দিন পরে আমিও আলিগড় ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসি।

এখন আমি ৮৬ বৎসর বয়সে শান্তিপূর্ণ সাংসারিক জীবন যাপন করছি। পিছু ফিরে তাকিয়ে যা দেখি, তা অনেকখানি আমার ছাত্রীজীবনের সঙ্গে জড়িত। সে সব স্মৃতি এখনো আমায় সুখ দেয়। ■

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073